The Chittagong University Journal of Arts and Humanities
ISSN 1993-5536
VOL.XXXIV, 2018 (pp. 37 - 56)
Published in October, 2023

বাঙালির দর্শনের গোড়ার ইতিহাস

ড. এফ, এম, এনায়েত হোসেন*

প্রতিপাদ্যসার

অন্যান্য প্রাগ্রসর জাতির ন্যায় বাঙালি জাতিরও রয়েছে দর্শন চিন্তার এক গৌরবময় ইতিহাস। বাঙালির রাজনৈতিক দর্শনের ইতিহাস যেমন যুগে যুগে বিদেশি শাসক দ্বারা পরিচালিত ও কলুষিত হয়েছে, তেমনি বাঙালির সমাজ ব্যবস্থা স্বাধীন বিকাশের পথ খুঁজে না পেয়ে বার বার হোঁচট খেয়েছে, যার ইতিহাসে প্রমাণ মেলে। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রথমে আর্য প্রভাব এবং পরবর্তীকালে তুর্কী-পাঠান-মোগলদের প্রভাব এবং পরাধীনতার শেষ সময়ে পাকিস্তানীদের কবলে পড়ে বাঙালি জাতির মুক্ত জ্ঞানচর্চা ও দার্শনিক চিন্তাধারাসমূহ বিপর্যয় কাটিয়ে কখনও স্বাধীনভাবে, আবার কখনো মুক্ত মনে বিকশিত হয়েছে। বিদেশি ভাবাদর্শ গ্রহণ করে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়ে কখনো কখনো বাঙালির সমাজ-সংস্কৃতি-সভ্যতা উজ্জীবিত হয়েছে; আবার নিজ ভাবধারার সাথে পাশ্চাত্য ভাবধারার সংশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাঙালির মনুষ্যত্ব যুগে যুগে পরিপুষ্ট ও বিকশিত হয়েছে। এভাবে, বাঙালি তার নিজ সত্তাকে অক্ষুন্ন রেখে রচনা করছে সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি এমনকি মনন চর্চার ধারাবাহিক ইতিহাস। সমাজের এই যে বহুমাত্রিক দর্শন তা কেবলমাত্র বাঙালিদের মধ্যেই লক্ষণীয়। বাঙালির রাষ্ট্রভাবনা, সমাজ-সভ্যতা-শিক্ষাভাবনা, মনন-সংস্কৃতি, এমনকি দার্শনিক ভাবনা অন্যান্য জাতির চিন্তা-চেতনার তুলনায় অনেকটাই ব্যতিক্রমধর্মী। যেহেতু, বাঙালি জাতির উদ্ভব হয়েছে নানান জাতির রক্ত ও বর্ণের সংমিশ্রণে, সেহেতু বাঙালির দর্শন ভাবনায়ও নানান জাতি-গোষ্ঠীর সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়, যা ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে। উল্লেখ্য, বাঙালি জাতির এ বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবনার সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে তাদের উদ্ভাবিত ও বিকশিত স্বকীয় দর্শন তথা বাঙালির দর্শনে।

---

*অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

১.১. ভূমিকা

মূলত বাঙালি জাতি গড়ে তোলে বাঙালি সমাজ। আর বাঙালি জাতি বলতে সেই জনসমষ্টিকে বুঝায়, যারা বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বা ঘরোয়া ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে। আদিকাল থেকেই বাঙালি জাতি ও বাঙালি সমাজের মধ্যে দার্শনিক জিজ্ঞাসা লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি জাতি যৌক্তিক ও বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে জীবন ও জগতের আদি ইতিহাস জানার ও বোঝার চেষ্টা করেছে, যা ইতিহাসে প্রমাণ মেলে। যুক্তিপ্রবণ বাঙালি জাতি কোনো ধারণা বা বিশ্বাসকে নির্বিচারে গ্রহণ না করে বরং মুক্ত ও স্বাধীন চিন্তার আলোকে সেই ধারণা বা বিশ্বাসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা চালায়। যথার্থ দর্শনের লক্ষ্য হলো বোধ বা উপলব্ধিকে প্রমাণযোগ্য করা এবং যুক্তিপ্রসূত সত্যকে প্রচারযোগ্য ও বিনিময়ক্ষম করা। এ অর্থে প্রকৃত দর্শনমাত্রই যুক্তির আলোকে দেখা বা কোনো ধারণা বা বিশ্বাসকে গ্রহণ বা বর্জন করার আগে তা খতিয়ে দেখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখে। প্রকৃতিগত দিক থেকে বাঙালির দর্শনের বৈশিষ্ট্যও এর ব্যতিক্রম নয়। কাজেই, বাঙালির দর্শনচর্চার ধারা অনুসন্ধানের জন্য এর আদি ইতিহাস জানার ও দার্শনিক ভাবনার দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন যা এ প্রবন্ধে তুলে ধরা হয়েছে।

১.২. গবেষণার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

জাতি হিসেবে বাঙালি যেহেতু শংকর সেহেতু এ জাতির দার্শনিক পরিচয় জানা আমাদের একান্ত কর্তব্য। পৃথিবীর সকল যুগেই দার্শনিকগণ জীবন ও জগতের রহস্য উদ্ভাবনে ছিলেন তৎপর। দার্শনিকগণ সাধারণ মানুষের ন্যায় অপরাপর নির্দেশ বা উপদেশের ওপর নির্ভর না করে নিজের বিবেক ও মুক্তবুদ্ধির আলোকে যে কোনো প্রশ্নের সদুত্তর অনুসন্ধানে ব্রতী থাকেন। দর্শনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, দার্শনিকরা তাঁদের জগৎ ও জীবন বিষয়ক মতবাদের জন্য যতটুকু শ্রদ্ধা ও সুখ্যাতি অর্জন করেছেন তার চেয়ে বেশি করেছেন সমস্যাবলির স্বাধীন বিশ্লেষণ ও তার সমাধান কৌশল উদ্ভাবনের জন্য। বাঙালির দর্শন বাঙালির চিন্তন, মনন, আচার-আচরণ, লৌকিকনীতি বা নৈতিকতা, ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, আবেগ, অভিজ্ঞতা তথা বাঙালির বহুমাত্রিক চিন্তাধারা নিয়ে আলোচনা করে এবং এ সব আলোচনার মাধ্যমেই বাঙালি তার আসল রূপ পরিগ্রহ করে যা গবেষণায় তুলে ধরা হয়েছে। বাঙালির তাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও ভাষাগত পরিচয়ে এ সত্যতার প্রমাণ মেলে। অনুসন্ধানে দেখা যায় আর্য, অনার্য, দ্রাবিড়, নিগ্রোটো, অস্ট্রিক, আলপাইনীয়, হাবসি, মঙ্গোলীয়, পর্তুগিজ, আরাকানি, মোগল, পার্সিয়, ব্রিটিশ, এশীয়, ইউরোপীয় নানান জাতির বণিক ও ধর্মীয় সম্প্রদায়সহ বহু জাতির রক্তের ধারা বাঙালির রক্তে সংমিশ্রিত হয়েছে। এসব শংকর জাতিগোষ্ঠী কীভাবে বাঙালি জাতি ও বাঙালির দর্শনে বহুমাত্রিকতা এনে দিয়েছে তা উদ্‌ঘাটন বর্তমান প্রজন্মসহ ভবিষ্যৎ প্রজন্মের একান্ত কর্তব্য বলে মনে করি। একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙালির দর্শন বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিপর্যয়ের পর বিপর্যয় কাটিয়ে কখনো ক্ষীণভাবে আবার কখনো বিস্তৃত পথ ধরে বিকশিত হচ্ছে। বৈদেশিক ভাবধারা গ্রহণ করে, বিদেশিদের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়ে নিজেদের ভাবধারার সাথে বৈদেশিক ভাবধারার সংশ্লেষণ ঘটিয়ে বাঙালির মনুষ্যত্ব সাধনার ধারা যুগে যুগে পরিপুষ্ট ও বিকশিত হচ্ছে,

যার অনুসন্ধান অত্যন্ত জরুরী। মধ্যযুগে আর্য ভাবধারার প্রভাবে ও আরব-ইরান থেকে আগত ইসলামের প্রভাবে বাঙালির মনোজগত ও দর্শন সমৃদ্ধ হয়েছে, যা গবেষণার দাবী রাখে। তাছাড়া আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও দর্শনের বিশেষ অংশ হিসেবে বাঙালির দর্শনের গুরুত্ব মূল্যায়নেরও প্রয়াস রয়েছে এ প্রবন্ধে।

১.৩. গবেষণা পদ্ধতি

আলোচ্য প্রবন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্য সংশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (synthetic method), বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি (analytical method) ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি (historical method) ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে গবেষণা সমস্যার সাথে সংশ্লিষ্ট বই, পুস্তক, জার্নাল, স্মারকগ্রন্থ, বাঙালির দর্শন বিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধমালা ও বক্তৃতামালা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সংগৃহীত উপাত্ত বিশ্লেষণী পদ্ধতির (analytical method) সাহায্যে বিশ্লেষণ করে গবেষণা কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। তাছাড়া, প্রবন্ধটিতে গুণগত (qualitative) ও পরিমাণগত (quantitative) উভয় ধরনের পদ্ধতিই অনুসরণের প্রয়াস রয়েছে।

১.৪. বাঙালির দর্শনের ঐতিহাসিক বিবর্তন

একথা অনস্বীকার্য যে, অতি প্রাচীনকাল থেকেই বাংলাদেশে দর্শন চর্চা হয়ে আসছে এবং বলা যায় গ্রীক দর্শনের ন্যায় এ দর্শনের ইতিহাসও বেশ পুরোনো। বাংলাদেশে প্রবর্তিত লোকায়ত, চার্বাক, জৈন, বৌদ্ধ ও আর্য-অনার্য দর্শন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বেদ, প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়া, *রামায়ণ*, *মহাভারত* প্রভৃতিতে চার্বাক লোকায়তের কথা উল্লেখ আছে। প্রাচীনকালে বাংলাদেশে লোকায়ত দর্শন চর্চা আরম্ভ হয় এবং ধীরে ধীরে তা সাধারণ মানুষের মাঝে পরিব্যপ্ত হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল গঙ্গাপথে; প্রথমে উত্তরবঙ্গে এবং পরবর্তী সময়ে সমগ্র বাংলাদেশে তা ছড়িয়ে পড়ে। কাজেই, বাঙালির জাতিসত্তা নিরূপণে বৌদ্ধ চিন্তা-চেতনা ও সংস্কৃতির একটি প্রভাব রয়েছে। সাম্যবাদিতা ও জীবনমুখীতার জন্য বৌদ্ধ দর্শন বাংলায় বেশ জনপ্রিয়। একথা অনস্বীকার্য যে, আর্যদের দ্বারা এ দেশে ভাববাদ ও অধ্যাত্মবাদের বিকাশ ঘটে। এই অধ্যাত্মবাদ আবার চার্বাকদের দ্বারা তীব্র সমালোচনার মুখে পড়ে। তাছাড়াও এ অঞ্চলে বিভিন্ন অধ্যাত্মবাদী দর্শন তার শাখা-প্রশাখাকে প্রসারিত করে বাংলাদেশ দর্শনের গুরুত্বকে আরও বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে।

বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম কখন মানুষের বসতি গড়ে উঠেছিল তা বলা বেশ মুশকিল। তবে আদিযুগে প্রস্তর নির্মিত যেসব অস্ত্র ব্যবহৃত হত সেগুলোই আদি যুগের অস্তিত্বের প্রমাণ বহন করে। প্রাচীনযুগে মানুষ যেসব অস্ত্র ব্যবহার করত পরবর্তীকালে এসব অস্ত্র পালিশ ও সুসংগঠিত করে মানুষ বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে ব্যবহার করছে। ইতিহাসে এ যুগকে বলা হয় যথাক্রমে

প্রত্নপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগ। সমগ্র ভারতবর্ষে প্রত্ন ও নব্যপ্রস্তর যুগের এমনকি তাম্রযুগেরও অস্ত্রসস্ত্র পাওয়া গেছে।[১] বাংলার বিভিন্ন বর্ণ ও শ্রেণির জনগোষ্ঠীর দেহের গঠন, বিশেষ করে কেশ, চোখ ও চামড়ার রং, নাসিকা, কপাল ও নরমুণ্ডের আকৃতি ব্যাখ্যা করে বলা যায় এ অঞ্চলে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। তবে এটা সত্য যে, সকল জাতিগোষ্ঠীর দেহের অবয়ব ও মানদণ্ড সমানভাবে গৃহীত হয়নি। ফলে, বাঙালির জাতিগত দার্শনিক অনুসন্ধানে বাঙালি জাতিকে মোটামুটি তিনটি যুগে বিন্যস্ত করা যায়। যথা

১. প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন যুগ;
২. বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন ও
৩. আধুনিক যুগ।

১. প্রাচীন ইতিহাস ও প্রাচীন যুগ

খ্রিস্টপূর্ব যুগে প্রতীচ্যে মানবকেন্দ্রিক দর্শনের প্রথম শুভসূচনা ঘটে সোফিস্টদের চিন্তাধারায়।[২] দার্শনিক আলোচনাকে বাস্তবমুখী ও কার্যকর করে তুলতে সোফিস্টরাই প্রথম মানবকেন্দ্রিক দর্শন রচনার ভিত মজবুত করেন। সোফিস্টরাই বলেন, মানুষই সকল কর্মকাণ্ডের পরিমাপক (Man is the measure of all things)। মানুষের রয়েছে স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের ক্ষমতা। কোনো বিশ্বাস জোরপূর্বক মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া উচিত নয় বলে তাঁরা মনে করেন। গুপ্তযুগের পূর্বে প্রাচীন বাংলার কোনো ধারাবাহিক ইতিহাস তেমন একটা পাওয়া যায় না। ভারতীয় ও বিদেশী সাহিত্যের বিক্ষিপ্ত উক্তি হতে এ সম্পর্কে সামান্য কিছু ধারণা মেলে বটে, তবে এর কোনো সুনির্দিষ্ট দিন, তারিখের উল্লেখ নেই।[৩] তবে *মহাভারতে* বঙ্গদেশের কয়েকটি রাজ্যের উল্লেখ আছে। ভারতবর্ষের যেসব ভূখণ্ড বিংশ শতকের পূর্বে বঙ্গদেশ বলে পরিচিত ছিল প্রাচীন হিন্দুযুগে এর কোনো নাম ছিল না। উল্লেখ্য, এর বিভিন্ন অংশের নাম ছিল এবং তা ছিল অধিকাংশই বিভিন্ন যুগের রাজ্যের নাম অনুসারে। খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে যখন আলেকজান্ডার ভারতবর্ষ আক্রমণ করে সেকালের বঙ্গ দেশ একটি রোগাক্রান্ত রাজ্য ছিল যা সমসাময়িক বিভিন্ন গ্রিক লেখকদের বর্ণনা হতে স্পষ্টই বোঝা যায়। প্রাচীনকালে বঙ্গদেশের কোনো সুনির্দিষ্ট সীমারেখা ছিল না। যুগে যুগে এর সীমা ও আয়তন পরিবর্তিত হয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে।[৪] গ্রীকরা 'গঙ্গরিডই' বা 'গঙ্গরিডাই' নামে যে এক পরাস্ত জাতির উল্লেখ করেছেন তারা যে আদি বঙ্গদেশের অধিবাসী এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। গঙ্গা নদীর যে দুটি স্রোত এখন ভাগিরথী এবং পদ্মা বলে পরিচিত তার উভয়ের মধ্যবর্তী প্রদেশে

গঙ্গরিডই জাতির বাসস্থান ছিল।[৫] প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন লেখায় উল্লেখ আছে যে, পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় কোনো রাজা বাঙালি ছিলেন কি-না তা নিশ্চিত নয়, তবে এ সময়ে বাঙালি রাজারাই যে অধিক শক্তিশালী ছিলেন এতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই।

১.১. মৌর্য সাম্রাজ্য: ইতিহাসে প্রমাণ মেলে বাংলা নামক ভূখণ্ডটি মৌর্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মৌর্য বংশের পতনের পর হতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা (আনুমানিক ১৮৫ খ্রিষ্ট পূর্বাব্দ হতে ৩২০ খ্রিষ্টাব্দ) পর্যন্ত পাঁচশত বছরের মধ্যে পূর্ব ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কোনো ঐতিহাসিক দলিলের উল্লেখ পাওয়া যায়নি। তবে এ যুগে গ্রীক ও রোমান লেখকরা গঙ্গরিডই সম্পর্কে যা লিখেছেন তা থেকে বোঝা যায়, এটি একটি সমৃদ্ধ রাজ্য ছিল। এ যুগেই গ্রীক সভ্যতা, দর্শন ও সংস্কৃতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। প্রাচীনযুগে দর্শনের আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে আবির্ভূত হন দার্শনিক প্লটিনাস। তিনি বলেন, এক পরিপূর্ণ শক্তি সমগ্র সৃষ্টি লীলার ভিত্তিমূলে কাজ করে চলছে।[৬] প্লটিনাসের এ দৃষ্টিভঙ্গি বাঙালি দর্শনের পরলোক বা মরমীবাদী চিন্তাধারা প্রবর্তনে সহায়তা করছে। তিনি বিশ্বাস করেন যে, মানুষের সর্বোচ্চ আদর্শ হলো ঈশ্বরের অনুধ্যান এবং ঈশ্বরের সাথে একাত্মতা স্থাপন। প্রাচীনযুগের প্লটিনাসের এ ভাবনা বাঙালির দর্শনকে প্রভাবিত করেছে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

১.২. গুপ্তযুগ: খ্রিষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত বংশের রাজারা ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ দিকপাল চন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্ত ও পৌত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিভিন্ন রাজ্য জয় করে সাম্রাজ্য বিস্তারের পাশাপাশি এ অঞ্চলে দর্শন ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্র রচনা করেন। এ বংশের শাসকগণ প্রায় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত রাজত্ব করেন এবং ইতিহাস, সাহিত্য, সংস্কৃতিসহ বাঙালির দর্শনের শ্রীবৃদ্ধি ঘটান। পাল ও চন্দ্ররাজাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় সমতট অঞ্চলে উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুর ও মহাস্থানে এবং দক্ষিণ বিহারের উত্তরাঞ্চলে বৌদ্ধ দর্শন যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে। গুপ্তত্তোরকালে সমগ্র উত্তর ভারতবর্ষের কিছু অংশে রাজনৈতিক অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। সমসাময়িক অবস্থার প্রেক্ষাপটে ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বাংলায় দুটি স্বাধীন সাম্রাজ্যের উত্থান ঘটে। প্রথমটি প্রতিষ্ঠিত হয় দক্ষিণ পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে। এটিই প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য নামে পরিচিত ছিল।[৭] দ্বিতীয় স্বাধীন রাজ্য ছিল পশ্চিম ও উত্তর বাংলাব্যাপী যা সাধারণভাবে গৌড় রাজ্য নামে পরিচিত। আদি বাংলার এসব অঞ্চলে খণ্ডিত আকারে হলেও বাঙালির দর্শন চর্চা শুরু হয় এবং ক্রমাগত তা এগোতে থাকে।

১.৩. স্বাধীন বঙ্গরাজ্যঃ ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমভাগে সমগ্র উত্তর ভারতে যশোধাবর্মন তাঁর রাজ্য ক্ষমতার বিস্তৃতি ঘটাতে প্রয়াসী হন। তিনি পূর্ব দিকের ব্রহ্মপুত্র নদ হতে পশ্চিমে আরব সাগর এবং উত্তরে হিমালয় হতে দক্ষিণে মহেন্দ্রগিরি পর্যন্ত রাজ্যের সীমা বিস্তৃতি ঘটান। ইতিহাসে প্রমাণ মেলে, যশোধাবর্মণের শাসনকাল খুব বেশি স্থায়ী না হলেও এ সময়েই গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস অনিবার্য হতে থাকে। এ সময়ে এ উপমহাদেশে গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচার নামক তিন রাজার তাম্র শাসনের উল্লেখ আছে। এ সময়ের বিভিন্ন তাম্রলিপি হতে পাওয়া তথ্যাদি বাঙালির দর্শনের গোড়াপত্তনের মূল রহস্য উদঘাটনে সহায়তা করে।

১.৪.স্বাধীন গৌড় রাজ্যঃ গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে 'পরবর্তীতে গুপ্তবংশ' বলে পরিচিত গুপ্ত উত্তরাধিকারী রাজাগণ উত্তর বাংলা, পশ্চিম বাংলার উত্তরাংশে ও মগধে রাজ্য বিস্তার করেছিল। এদের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি, দর্শন তৎকালীন বাঙালির জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত এ অঞ্চল গৌড় জনপদ নামে পরিচিতি লাভ করে। গৌড় বলতে অনেক সময় বাংলাভাষী সমগ্র অঞ্চলকে বোঝানো হতো এবং এঁদের দার্শনিক জিজ্ঞাসা বাংলার মানুষকে আপ্লুত করেছিল ব্যাপকভাবে। আদি গৌড় অঞ্চলের রাজনৈতিক ক্ষমতার সম্প্রসারণই (শশাঙ্ক থেকে পালযুগ পর্যন্ত) এর ব্যাপকতার প্রধান কারণ।[৮] অবশেষে, ৬ষ্ঠ শতাব্দীর শেষে বা ৭ম শতাব্দীর গোড়ার দিকে গৌড় অঞ্চলে শশাঙ্ক স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতা দখল করেন এবং স্বাধীন গৌড় রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। কাজেই বলা যায়, সে সময়কার বিভিন্ন শিলালিপি বাঙালির দার্শনিক পরিচিতি উদ্‌ঘাটনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

১.৫. শশাঙ্কঃ বাঙালি রাজাদের মধ্যে শশাঙ্কই ছিলেন প্রথম স্বাধীন নরপতি। তিনি শুধু গৌড়ের সার্বভৌম ক্ষমতারই অধিকারী ছিলেন না বরং গৌড় রাজ্যের সীমা মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও উড়িষ্যার উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃতি করে সে সময়কার দর্শনের অগ্রযাত্রাকে এগিয়ে নিয়ে যান। এমনকি উত্তর ভারতের রাজনীতি, অর্থনীতি, দর্শন প্রভৃতি অঙ্গনে হস্তক্ষেপ করার মতো প্রচুর শক্তিও তিনি অর্জন করেন। তাঁর নেতৃত্বেই সর্বভারতীয় রাজনীতিতে 'বাংলাদেশ' নামক রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে এবং বীজ বপন করা হয় বাঙালির দর্শনের।[৯] কাজেই, শশাঙ্ককে প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের প্রসিদ্ধ নরপতি বলা হয়।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর যে সব পাল রাজা এ অঞ্চলে শাসনকার্য পরিচালনা করেন তাঁরা হলেন, গোপাল, ধর্মপাল, দেবপাল, শূরপাল, বিগ্রহপাল, নারায়ণ পাল, মহেন্দ্র পাল, রাজ্যপাল প্রমুখ। পাল সাম্রাজ্যের পতনের পর বাংলায় বিভিন্ন রাজবংশ তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করেন এবং প্রচার করেন বিভিন্ন ধর্ম-দর্শনের। এঁদের মধ্যে চন্দ্রবংশ ও ধর্মরাজবংশ বিশেষভাবে

উল্লেখযোগ্য। পাল রাজাদের দুর্বলতার সুযোগে ভারতীয় উপমহাদেশে সেন রাজারা তাঁদের ক্ষমতার ভিতকে শক্ত করেন। এ বংশের উল্লেখযোগ্য রাজা হলেন বিজয় সেন, বল্লাল সেন, লক্ষণ সেন, কেশব সেন প্রমুখ। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিক্রমপুর অঞ্চলে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে দেব রাজবংশের উত্থান ঘটে।[১০] দেব রাজবংশই এ অঞ্চলের শেষ হিন্দু রাজবংশ। কারণ ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষে এবং চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতেই এ অঞ্চলে মুসলমান শাসকদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়; উত্থান ঘটে বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায়ের। সুলতানী আমলে বিদেশী পর্যটকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইবনে বতুতা। তিনি ১৩৩৩ সনে এ অঞ্চলে আগমন করে দীর্ঘ নয় বছর অবস্থান করেন। এ সময়েই এ অঞ্চলে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটতে থাকে এবং বাঙালিরা বিভিন্ন দেশে ব্যাবসা-বাণিজ্য করার সুযোগে নিজ দর্শন প্রচারেরও সুযোগ পান।[১১]

২. বঙ্গদেশে মুসলিম শাসন

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সেন শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশে মুসলিম শাসনের সূচনা করেন মুহাম্মদ বখতিয়ার খিলজী। এ সময়ে এ অঞ্চলে মুসলিম শাসনের পাশাপাশি বহু জায়গায় মসজিদ, মাদ্রাসা, খানকাহ প্রভৃতি তৈরি করা হয়। বখতিয়ার খিলজীর শাসনের পর এ অঞ্চলে তুর্কি শাসন, বলবনী শাসন, স্বাধীন সুলতানী আমল, ইলিয়াস শাহী শাসন, হাপসী শাসন, আফগান শাসন এবং সবশেষে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর কালক্রমে বাংলায় শাসন করেন সুবেদার শায়েস্তাখান, সুবেদার ইব্রাহীম খান, মুর্শিদকুলী খান, নবাব সুজাউদ্দিন খান, সরফরাজ খান, নবাব আলীবর্দী খান ও সবশেষ নবাব সিরাজউদ্দৌলা। সিরাজউদ্দৌলার শাসনামলেই বাংলায় পলাশীর যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এরপর বাংলা পুরোপুরি চলে যায় ইংরেজদের দখলে এবং তারা প্রায় দু'শত বছর ধরে এ অঞ্চল রাজত্ব করতে থাকে।[১২] এ সময়ে পাশ্চাত্যের বহু দার্শনিক তত্ত্বধারা বাংলায় অনুপ্রবেশ করে, ফলে এ অঞ্চলে নিজস্ব দর্শন সৌধ গড়ে ওঠে। উল্লেখ্য, বাঙালিরা পাশ্চাত্য থেকে আসা তত্ত্বধারাসমূহ যেমন উপযোগবাদ, মানবতাবাদ, মার্কসবাদ, যৌক্তিক দৃষ্টবাদ পুরোপুরি বর্জন করেনি, বরং এসব ধারা আধুনিকযুগে হলেও বাঙালির দর্শন বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে কিংবা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলায় মুসলিম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় মুসলমানদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, দার্শনিক সমস্যা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনার ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। এক্ষেত্রে উঁচু শ্রেণির মুসলমানরা নেতৃত্ব দান করেন। উল্লেখ্য, ব্রিটিশদের সহযোগিতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা লাভ ও অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলার মুসলমানরা বাংলাভাষী শিক্ষা

গ্রহণ ও তা প্রসারের মাধ্যমে এ অঞ্চলে শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন, প্রভৃতিতে বিরাট সাফল্য অর্জন করে রচনা করে বাঙালির দর্শন।[১৩]

৩. আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনব্যবস্থা এ দেশের সকল শ্রেণির মানুষকে আকৃষ্ট করতে না পারলেও অনেক হিন্দু জমিদার তাদের সাথে আঁতাত করে, ফলে এ অঞ্চলে হিন্দুরা শিক্ষা-দীক্ষা, চাকুরী, সাহিত্য, সংস্কৃতি, দর্শন চর্চা প্রভৃতিতে এগিয়ে যায়। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এদেশে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করে শক্তি বৃদ্ধি করতে থাকে এবং এ অঞ্চলের মানুষকে নানাবিধ উৎকোচ দিয়ে তারা তাদের সুযোগ সুবিধা আদায় করতে থাকে। ১৮৭০ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এ অঞ্চলের অফিস-আদালতসহ সর্বত্র নিজেদের অবস্থানকে সুসংহত করে এবং এ দেশীয় কর্মকর্তাদের দায়িত্বপূর্ণ পদ থেকে সরিয়ে প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে একপেশে করার চক্রান্ত করে।

৩.১. ব্রিটিশ বিরোধী সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন: পলাশীর যুদ্ধের মাধ্যমে বঙ্গদেশে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, দর্শন, প্রভৃতি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়।[১৪] তাছাড়া, ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে এ অঞ্চলে প্রথম থেকেই পরিচালিত হয়ে আসছিল বিভিন্ন সংস্কারবাদী আন্দোলন। এগুলোর মধ্যে উত্তর বঙ্গের ফকির সন্যাসী-বিদ্রোহ, রংপুর বিদ্রোহ, বালকী শাহের বিদ্রোহ, আগা মোহাম্মদ রেজার বিদ্রোহ, পাগলপন্থী বিদ্রোহ, তিতুমীরের বিদ্রোহ, সিপাহী বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় আগমন ঘটে দু'জন যুগান্তকারী মনীষীর; এঁরা হলেন রাজা রামমোহন রায় ও হাজী শরীয়তুল্লাহ। রাজা রামমোহন রায় হিন্দু সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন ধর্মীয় কুসংস্কার দূর করে 'এক ঈশ্বরবাদী' দর্শন রচনা করতে প্রচেষ্টা চালান। অন্যদিকে, হাজী শরীয়তুল্লাহ ইসলামের আদি নির্যাস (essence) গ্রহণ করে সমাজে বিদ্যমান বিভিন্ন কুসংস্কারসমূহ দূর করতে ছিলেন সদা সচেষ্ট।

৩.২. জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বাঙালির মুক্তির দর্শন: বাংলায় জাতীয়তাবাদের প্রথম উদ্ভব ঘটে উনবিংশ শতকে। এ সময়েই বঙ্গদেশ পাশ্চাত্যের শিক্ষা, সংস্কৃতি, সভ্যতা, কলাকৌশল, আচারনিষ্ঠা প্রভৃতির সংস্পর্শে আসে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভারতে যে জাতীয়তাবাদের শুভ সূচনা হয় তা পাশ্চাত্যের শিক্ষা সংস্কৃতির প্রত্যক্ষ ফল বলে ইতিহাসে উল্লেখ আছে। বলা বাহুল্য, এ সময়েই বাঙালির মনে তথা সমগ্র বাংলায় সামাজিক, অর্থনৈতিক এমনকি রাষ্ট্রীয় জীবনে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আসে। পরিবর্তিত হতে থাকে শুধুমাত্র ধর্মাশ্রিত মধ্যযুগীয় ধ্যান-ধারণার; গতানুগতিক রীতি-নীতির

পরিবর্তে দেখা দেয় যুক্তিবাদ, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির। এ ধারাবাহিকতায় ক্রমাগত আন্দোলন ও বাঙালির দাবীর মুখে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৭ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান, ১৯৭০-এর সাধারণ নির্বাচন এবং সবশেষে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয়ের মাধ্যমে বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্থান করে নিয়েছে।[১৫] স্বীকৃতি অর্জন করতে পেরেছে এ জাতির নিজস্ব দর্শন তথা বাঙালির দর্শনের।

১.৫. বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক ও ভাষাগত পরিচয়ঃ

১.৫.১. বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বলা যায়, বেঙ্গল ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে বাঙালি জাতির উদ্ভব। বাঙালি জাতির উপর আর্যদের প্রভাব ছিল নগণ্য, কারণ আর্যরা তৎকালীন বাংলায় খুব বেশি-দিন বসবাস করেনি। রিজলীর মতে, বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতি থেকে প্রাপ্ত, যা ইতিহাসে সাক্ষ্য মেলে। কাজেই বলা যায়, মঙ্গোলীয় ও দ্রাবিড় জাতির সংমিশ্রণে প্রাচীন ভারতীয় জাতির উদ্ভব। বাঙালির পূর্ব পুরুষেরা যখন ভারতবর্ষে আগমন করে তখন বৈদিক আর্যগণ পূর্বদিকে গঙ্গানদীর উপত্যকায় অনেক দূরে এগিয়ে ছিলেন। কাজেই, বাঙালির পূর্বপুরুষগণ মধ্যভারতের সমভূমি (Table Land) পার হয়ে বঙ্গদেশে আসেন।[১৬] এভাবেই, বাঙালি তাঁদের পূর্বসূরীদের দার্শনিক ভাবনা এদেশে প্রচার ও প্রসার ঘটান।

ইতিহাসের আলোকে বলা যায়, বাঙালি শঙ্কর জাতি বলে বাঙালির নৃতাত্ত্বিক পরিচয় বহুমাত্রিক। এ অঞ্চলের মানুষের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবয়বগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নৃ-বিজ্ঞানীরা মোটামুটিভাবে একমত হয়েছেন যে, নিগ্রোটো, আদি-অষ্ট্রেলীয় ও মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠীর অধিক প্রভাব পড়ে বাঙালির জাতিসত্তায়। কোল, নিষাদ, সাঁওতাল, শরব, পুলিঙ্গ, মালপাহাড়, প্রভৃতি হচ্ছে অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ আদি অষ্ট্রেলীয়। আর কিরাত, রাজবংশী, নাগামিজো, কুকি, চাকমা, আরাকানী প্রভৃতি হচ্ছে স্বল্প সংখ্যক মঙ্গোলীয়। এছাড়াও, কালের প্রবাহে গৌড়, হূণ, কুলিক, কর্ণাট, শক, ইরানী, হাবসী, গ্রীক, তুর্কী, মুঘল, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ইংরেজ, প্রভৃতি রক্তের মিশ্রণ রয়েছে বাঙালির জাতিসত্তায়।[১৭] প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদি অবস্থা থেকে শুরু করে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে অদ্যাবধি বাঙালির সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, দর্শন বিকশিত হচ্ছে; পরিবর্তন ঘটছে বাঙালির ভাগ্যের, চলন-বলন এবং কর্মের।

আধুনিক ভারতীয় বহু পণ্ডিত বাঙালি জাতির নৃ-তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন যে, ঐতিহাসিককালে মোটামুটি চার শ্রেণির নরগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাঙালি জাতির উদ্ভব। এদের মধ্যে প্রথমটি হলো উঁচু দেহ ও উঁচু মাথা বিশিষ্ট উত্তর ভারতীয় জাতি, যাদেরকে ভারতবর্ষে আগত আর্যদের আদি বংশধর বলে গণ্য করা হয়। উত্তর ভারত এবং পাঞ্জাব ও রাজপুতনায় এদের অস্তিত্ব বিদ্যমান। দ্বিতীয় নরগোষ্ঠীকে দ্রাবিড় মুণ্ডাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলা হয়। বাংলায় তথাকথিত নীচু শ্রেণীর মধ্যে এ জাতীয় নরগোষ্ঠীর প্রমাণ মেলে। গোল মাথাওয়ালা জাতি হলো তৃতীয় শ্রেণির নরগোষ্ঠী। এদের অন্য নাম হলো আলপাইনীয় নরগোষ্ঠী। এ জাতীয় নরগোষ্ঠী বাংলায় শিক্ষিত, ভদ্র সমাজে বেশি পরিলক্ষিত হয়। সিন্ধু, গুজরাট, মধ্যভারত, কর্ণাটক এবং অন্ধ্র প্রদেশে এ জাতীয় নরগোষ্ঠীর প্রমাণ মেলে। চতুর্থ হলো মঙ্গোলীয় নরগোষ্ঠী। এ জাতীয় নরগোষ্ঠীর লোকেরা সাধারণত লেপচা, ভুটিয়া, চাকমা, গারো, হাজং, মুরং, খাশিয়া, মগ, ত্রিপুরা মিজো, প্রভৃতি নামে পরিচিতি লাভ করে।[১৮] সাধারণত এ জাতীয় নরগোষ্ঠীর সংখ্যাই এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি। গুপ্তযুগে প্রাপ্ত তাম্রশাসন ও শিলালিপি থেকে বোঝা যায় যে, আর্যদের ধর্মীয় ও সামাজিক রীতি-নীতি এ সময়ে বাংলায় সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। তাছাড়া, দ্বাদশ শতাব্দীতে তুর্কী বিজয়ের পর থেকে কিছু সংখ্যক তুর্কী আরব পাঠান ও মুঘলদের সাথে বাঙালিদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এভাবেই মগ, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ প্রভৃতির রক্ত সঞ্চারিত হয়েছে বাঙালির রক্তে। কাজেই এটা স্পষ্ট যে, প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত বহু নরগোষ্ঠী ও জাতির সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বাঙালি জাতি। এসব জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকের কম-বেশি মিশ্রণ রয়েছে বাঙালির জাতিসত্তায়।[১৯] বঙ্গদেশে প্রথম কখন মানুষের বসতি গড়ে উঠেছে তা বলা মুশকিল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আদি যুগের মানব প্রস্তর নির্মিত যেসব অস্ত্র ব্যবহৃত হতো সেসবই আদি যুগের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। প্রাচীনযুগের মানুষ যেসব অস্ত্র ব্যবহার করে তা গঠনে তেমন কোনো নতুনত্ব ছিল না বটে কিন্তু পরবর্তীতে এসব অস্ত্র পালিস ও সুগঠিত করে ব্যবহার করার প্রমাণ মেলে। এ যুগে বাংলার বাকুয়া, বর্ধমান, মেদেনীপুর জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষের তৈরি বিভিন্ন পুরোনো হাতিয়ার পাওয়া যায়, যা থেকে বাঙালির আদি নৃ-গোষ্ঠীর অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে।[২০]

উপরোক্ত আলোচনায় এটা স্পষ্ট যে, আদি অষ্ট্রিকরাই এ দেশের প্রাচীনতম বাসিন্দা; এরা মূলত ভূ-মধ্যসাগরীয় জনগোষ্ঠী। এরা জলপথে বাংলায় প্রবেশ করে অথবা স্থলপথে দক্ষিণ উপকূল হয়ে বাংলার উড়িষ্যায় ও ছোট নাগপুরে আধিপত্য বিস্তার করে এবং পরবর্তীতে ভারতে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এঁরাই দ্রাবিড় নামে পরিচিত। এঁদের কিছু অংশ অষ্ট্রিকদের সাথে

বসবাস করে। সময়ের পথ পরিক্রমায় পারস্পরিক সম্পর্কের ফলে উভয়ের রক্তের মিশ্রণ বাঙালির জাতি সত্তায় অনুপ্রবেশ করেছে।[২১]

১.৫.২. প্রত্যেক জাতির রয়েছে নিজস্ব ভাষা। বাঙালিদের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম নেই। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বাংলার প্রান্তিক ভাষা এবং এ ভাষা প্রাচীন ও মধ্যভাগ অতিক্রম করে বঙ্গ দেশে এসে মিশেছে। প্রাচীন ভারতীয় আর্যস্তর থেকে ক্রমশ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে বাংলা ভাষা আজ তার নিজস্ব রূপ ফিরে পেয়েছে। বাংলাদেশ ছাড়াও এ উপমহাদেশের পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় এ ভাষা দৈনন্দিন কাজ-কর্মে বহুল ব্যবহৃত হচ্ছে। এ ভাষার প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও মর্যাদাবোধ রক্ষা করতে গিয়ে বাঙালিরা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন; শেষ পর্যন্ত সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মায়ের ভাষা বাংলাকে। এভাবে আত্মপ্রত্যয়ী বাঙালি জাতি সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছে, রচনা করছে নিজ ভাষায় তাদের নিজস্ব দর্শন।

এটা স্পষ্ট যে, কালের ধারাবাহিকতায় বাঙালির জাতিগত পরিচয় ক্রমশ বিবর্তিত হচ্ছে; বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর অন্তরভাব ও বহিরঙ্গ-অবয়বে এসেছে পরিবর্তন। বাংলা ভাষাকে তার কাল অনুসারে চার[২২] ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

i. নব্যযুগ (১৮০০ খ্রিষ্টাব্দ হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত);
ii. মধ্যযুগ (১৩৫০ হতে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত);
iii. সন্ধিযুগ (১২০০ হতে ১৩৫০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত); এবং
iv. প্রাচীনযুগ (৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত)।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা কিংবা আদিম প্রাকৃতের পূর্বে প্রাচীন ভারতীয় গৌড়, অপভ্রংশ, মগধী প্রভৃতি ভাষা এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। এসব ভাষা হতে মোটামুটি তিনটি ভাষা বহুল প্রচলিত দেখা যায়। যথা-১. পাশ্চাত্য বা ইরানিক ভাষা ২. মধ্যবর্তী বা দারদিক ভাষা এবং ৩. প্রাচ্যে প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা। ইরানিক হতে আবেস্তিক, প্রাচীন পারসিক, আধুনিক পারসি, পশতু প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হয়। দারদিক ভাষা হতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের যাবতীয় ভাষার উদ্ভব। এছাড়াও, আর্য ভাষার পূর্বে এ অঞ্চলে ছিল শতম ভাষা। এ ভাষা হতে আর্য ভাষা তিনটি ধারায় প্রবাহিত। যথা ১. বাল্টো স্লাভিক ২. আলবানিক ও ৩. আরমানিক। পরবর্তীতে বাল্টো স্লাভিক ভাষা প্রসারিত হয়ে বাল্টিক ও স্লাভেনিক ভাষায় রূপান্তরিত হয়। বাল্টিক ভাষা হতে প্রাচীন প্রুসীয়, লিমুয়ানীয় ও লেট ভাষার উদ্ভব হয় এবং স্লাভেনিক ভাষা হতে রুশ,

বুলগার, পোল, সাধ, ক্রোয়াট প্রভৃতি ভাষার উদ্ভব হয়।[২৩] উল্লেখ্য, বর্তমানে ভারতবর্ষের অনেক অঞ্চলে এসব ভাষার অস্তিত্ব তেমন একটা দেখা যায় না, যদিও এসব ভাষা ছিল বাংলার প্রাচীনতম ভাষার অন্তর্গত।

আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, বাংলা ভাষায় কমপক্ষে আড়াই হাজারের বেশি ফরাসি শব্দের মিশ্রণ রয়েছে। পারসিক, গ্রীক, তুর্কী, ফরাসি, আরবি ছাড়াও বাংলা ভাষায় একাধিক অনার্য ভাষার মিশ্রণ ঘটেছে। খ্রিষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজ বনিকদের প্রভাবে পর্তুগীজ শব্দ বাংলায় স্থান করে নেয়। এছাড়াও, ফরাসি ও ওলন্দাজদের প্রভাবে কিছু পাশ্চাত্য শব্দ বাংলা ভাষায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। তবে পশ্চিমাদের ভাষার মধ্যে ইংরেজি ভাষাই মূলত বাঙালি ও বাংলা ভাষার উপর প্রভাব বিস্তার করে বেশি। এর কারণ ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে বাঙালি জাতি আধুনিক বিশ্বের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে সহজভাবে এবং আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন অনুশীলনে ইংরেজি ভাষা বাঙালির প্রধান ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে যার ধারা এখনো অব্যাহত আছে। ফলে, বহু ইংরেজি শব্দ বাংলার লিখিত এবং কথ্য ভাষায় স্থান করে নিয়েছে এগুলোর মধ্যে চর্চাগীতিকাগুলো অন্যতম।[২৪] চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' মধ্য বাংলার পরবর্তীরূপের সুস্পষ্ট আদিস্তর নির্দেশ করে।

প্রাচীন বাংলা ভাষায় কিছু সংস্কৃত শব্দের প্রভাব প্রথম থেকেই বিদ্যমান ছিল। কারণ, সংস্কৃত ভাষা ছিল প্রায় সমগ্র ভারতের সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চার প্রধান বাহন। এ যুগে বাংলাভাষা অনেকেই সংস্কৃত ভাষায় কাব্য রচনা করতেন। ফলে, প্রাচীনকাল থেকেই তৎসম ও অন্যান্য শব্দের প্রভাব বাংলা ভাষায় কম-বেশি দেখা যায়। এছাড়াও, ত্রয়োদশ শতকে বঙ্গদেশে মুসলিম শাসনের পর থেকে আরবি-ফারসি ও তুর্কি ভাষার প্রভাব বাংলা ভাষায় পড়েছে। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে মুসলিম শাসনামলে ফারসি ভাষা রাজভাষা হওয়ায় এ ভাষার প্রভাবও বাংলার উপর পড়েছে বিস্তর। এ সময়ে মুসলমান শাসকদের সরাসরি পৃষ্ঠপোষকতার ফলে তৎকালীন পণ্ডিতদের কথিত 'গৌড় ভাষা'র শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, এবং এ সময়েই বাংলায় তৎসম শব্দের ব্যবহার বহুগুণ বেড়ে যায়। মধ্যযুগে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে ফার্সির প্রভাব উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।[২৫]

সপ্তদশ কিংবা অষ্টাদশ শতকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় বাংলায় প্রথমবারের মতো গদ্যভাষার কার্যকর ব্যবহার শুরু হয়। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে ইংরেজ শাসনামলে ইউরোপীয় শিক্ষার প্রভাবে বিভিন্ন বিদেশি ভাষার প্রভাব বাংলা

ভাষায় যুক্ত হতে থাকে। ১৮০১ সালে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাংলা বিভাগ প্রতিষ্ঠার পর বিভাগের প্রধান উইলিয়াম কেরী ও তাঁর সহযোগী বাঙালি পণ্ডিতদের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষায় গদ্য রচনা শুরু হয়।[২৬] এছাড়াও সাধারণ মানুষের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম এবং জৈন ধর্মের মূলতত্ত্বকে পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে প্রাকৃত ভাষা বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হতে থাকে। পরবর্তীতে উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, মীর মোশাররফ হোসেন প্রমুখের প্রচেষ্টায় বাংলা ভাষা তার গতি সঞ্চার করে। তৎসম, তদ্ভব শব্দের ব্যবহারে এ ভাষা হয়ে ওঠে সাহিত্য পাঠের যথার্থ বাহন হিসেবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিংশ শতকে কথ্য ভাষা লেখ্য ভাষায় উন্নীত হয় মূলত প্রমথ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ আরও অনেক প্রতিভাবান বাঙালিদের হাত ধরে।

আধুনিককালে বাংলা ভাষার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে গদ্য ভাষার লিখন, প্রসার, উন্নয়ন ও এসবের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিতকরণ। উনিশ শতকে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারকদের প্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির উদ্যোগে বাংলা ভাষার (গদ্য ও পদ্য) উল্লেখযোগ্য মানোন্নয়ন ঘটে। সবশেষে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (১৯২৬) বাংলার চারটি প্রধান উপ-ভাষার কথা উল্লেখ করেছেন, যথা রাঢ়, বঙ্গ, কামরূপ ও বরেন্দ্র। পরবর্তী সময়ে সুকুমার সেন (১৯৩৯) আরও একটু পরিবর্তন করে বলেন, রাঢ়, বাঙালি, কামরূপী, বরেন্দ্রী ও ঝাড়খণ্ড ভাষা বাংলা ভাষায় স্থান করে নেয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মানব ইতিহাসের আদিপর্ব থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী আবির্ভাবের সুস্পষ্ট প্রমাণ মেলে।[২৭]

১.৬. বাঙালির ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চায় দর্শনঃ

বাঙালির সংস্কৃতি ও জীবনবোধের সাথে ধর্মবোধের রয়েছে এক গভীর সম্পর্ক। বাঙালি জাতির ধর্মীয় চেতনা, বিশ্বাস ও নীতিবোধ ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। এ জাতি সব সময়ই স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছে, যা তাদের নিজস্ব চিন্তা-চেতনায় স্বীকৃত। তাছাড়াও জন্মান্তরবাদ, কর্মবাদ, মায়াবাদ, মোক্ষচিন্তা ও প্রেমতত্ত্ব বাঙালির মনে প্রভাব বিস্তার করেছে সবসময়। এসব ধর্মবোধ ও কর্মসাধনা বাঙালির জনজীবনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সাংখ্য, যোগ এবং তন্ত্র এই তিনটি দর্শন স্বতন্ত্রভাবে এ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। বাঙালির শিব ও ধর্ম ঠাকুর মূলত বাঙালির ধর্মীয় সংস্কৃতিরই প্রতিফলন। শিবের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে বাঙালি সমাজে একদিকে যেমন বৌদ্ধ তান্ত্রিক, ব্রাহ্মণ্য তান্ত্রিক, নাথপন্থী, বৌদ্ধ সহজিয়াসহ বিভিন্ন মতবাদের বিকাশ ঘটেছে, তেমনি সুফি মতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এ অঞ্চলে বিভিন্ন তাসাউফপন্থী দর্শনের বিকাশ

ঘটেছে বহুল পরিমাণে।[২৮] বৌদ্ধ সহজিয়ার দোহা ও চর্যাপদ, বৈষ্ণব সহজিয়ার সহজিয়া পদ, বাউল দর্শনের বাউল গীতি (অচিন পাখি), ধর্ম মঙ্গল, গোরক্ষ বিজয়, মনসা মঙ্গল, নূর নামা, তামিল নামা, যোগচিন্তামনি ইত্যাদি রচনাবলী এ অঞ্চলের বাঙালির ভাব দর্শনের সাক্ষ্য বহন করে। কেবলমাত্র প্রাচীন বা মধ্যযুগই নয় বরং আধুনিকযুগেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত বাঙালির মানস গঠনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। এ ধর্মমত ও আচার-অনুষ্ঠানের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে প্রাচীন বাঙালির ধর্ম ও সাংস্কৃতিক পরিচয় এবং আধুনিক বাঙালির ঐতিহ্য। বাঙালির এসব প্রাচীন ধর্মমত ও সংস্কৃতির চুলচেরা বিশ্লেষণই বাঙালির দর্শনকে সমৃদ্ধ করতে পারে। একথা অনস্বীকার্য যে, বাঙালির জীবনে ধর্ম ও সংস্কৃতি একে অন্যের পরিপূরক। সাংখ্য, যোগতন্ত্র ও দেহতত্ত্ব, নারী দেবতা, পশু-পাখির পূজা, বৃক্ষ দেবতা ও জন্মান্তরবাদের ধ্যান-ধারণা থেকে বাঙালির হিন্দু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে পুরোপুরিভাবে মুক্ত রাখা যায়নি। বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য, ইসলাম, হিন্দু, প্রভৃতি ধর্মমত গ্রহণ করে নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্রের প্রভাব বাঙালি কখনই বর্জন করতে পারেনি, অদূর ভবিষ্যতেও পারবে বলে মনে হয় না। এটাই বাঙালির বিভেদের মধ্যে ঐক্যের সুর, বিচ্ছিন্নতার মধ্যে সংহতির মূর্ত প্রকাশ। আধুনিক পণ্ডিতদের মতে, এর মধ্যে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে খুঁজে বের করতে হবে বর্তমান প্রজন্মকে।[২৯]

বাঙালির প্রাচীনযুগের ইতিহাস রচিত হয় জনপদভিত্তিক, মধ্যযুগের হয় অঞ্চলভিত্তিক, আর আধুনিকযুগের ইতিহাস হবে বাঙালির জাতিসত্তার চেতনা ও পরিচিতি ভিত্তিক। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্য খুঁজবে জীবিকা পদ্ধতিতে এবং সাংখ্য, যোগ ও তন্ত্র দর্শনে; মধ্যযুগে খুঁজব জীবন জীবিকার অরি মিত্রদের কল্পনায় ও বিদেশি প্রভাবে এবং আধুনিকযুগের ইতিহাসে সন্ধান করব ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান সমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রভাবের ব্যাপকতা ও গভীরতার নিরিখে। আত্মপ্রবঞ্চনা ত্যাগ করলে, সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করলে বাঙালি জাতি উন্নতি করবে এটা আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। আত্মপ্রবঞ্চনা, আত্মপ্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা ত্যাগ করে আমরা প্রত্যেকে যদি আমাদের আদি উৎসের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করি তাহলে বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে।[৩০] কেননা, বাঙালি সংস্কৃতির আদি উৎস নানাবিধ মাহাত্ম্যে আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। যে মানবতাবোধের উপর বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত তার যথাযথ লালন ও অনুশীলনের মধ্যেই বাঙালির সার্থকতা নিহিত বলে পণ্ডিতগণ মনে করেন।

১.৭. বাঙালির মনন বৈশিষ্ট্য ও দার্শনিক ক্রমবিকাশঃ

সংস্কৃত ও পালি ভাষায় বাঙালির দর্শন ও বৌদ্ধ দর্শনচর্চার পরবর্তী সময়ে বাঙালির মনন সাধনার প্রথম প্রমাণ মেলে বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাগীতি'তে। এ গানের সুরের মধ্যে প্রাচীন বাঙালির সে সময়কার সমাজ ও জীবন জিজ্ঞাসার বাস্তব প্রতিফলন প্রস্ফুটিত। এ সময়ে বাঙালিরা শ্বশুর-শাশুড়ি, ননদ-দেবর, শ্যালক-শ্যালিকা, বধু-সন্তান নিয়ে যৌথ পরিবারে একত্রে বসবাস করে যা বিশ্বের অন্য কোনো দেশে বা অন্য কোনো সমাজে তেমনটা দেখা যায় না। অর্থাৎ, তখনকার সময় তাদের একমাত্র চিন্তা ছিল দু'মুঠো মোটা চালের ভাত খেয়ে বাঁচা। এছাড়াও চর্যাগীতে উল্লেখ আছে, হাঁড়িতে ভাত নেই, নিতি আবেশী।[৩১] দুঃখের এ হাহাকার অভাবগ্রস্ত বাঙালির এক মর্মস্পর্শী দিক। চর্যাগানে আরো উল্লেখ আছে, অভাবগ্রস্ত নারী চায় ভালো স্বামী, চায় ভালো সন্তান। সে চিন্তা করে সন্তান যেন বেঁচে থাকে অর্থ-বৈভবে; দুধে-ভাতে। অথচ, সে যা চায় তা সে পায় না। স্বামী হয় বেকার না হয় উদাসীন, সন্তান হয় বাউল। তৎকালীন গ্রাম বাংলার সামাজিক চিত্র এভাবে চর্যাগীতে বর্ণিত আছে; এভাবে প্রমাণ মেলে তৎকালীন গ্রাম বাংলার প্রাচীনতম দর্শনের। বাঙালিরা বিভিন্ন ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছে বটে তবে তা নির্বিচারে নয় বরং জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্যধর্ম এমনকি ইসলাম ধর্মকেও তারা নিজ নিজ গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছে।

বাঙালির মনন সাধনার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি ঐহিক জীবন প্রণালীর উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করে আসছে। বাঙালি মাত্রই যেন ঐহিক জীবন সন্ধানী। বাঙালিরা পাশ্চাত্য ধর্ম, দর্শন ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও তারা কোনো কিছুকেই অবিকৃত রাখেনি। জৈন, বৌদ্ধ, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও উপাসনাকে তারা তাদের নিজস্ব রুচি ও পছন্দানুযায়ী রূপ দিয়ে আপন করে নিয়েছে।[৩২] এ যেন বাঙালির মনন সাধনার এক অপরিহার্য বৈশিষ্ট্য। নৈরাত্মবাদী, ঈশ্বরবিমুখ বৌদ্ধধর্ম বাঙালি মানসে মন্ত্রযান-কালচক্রযান-বক্রযান-সহজযানে রূপ নিয়েছে। এভাবে, অন্যান্য পরধর্ম ও পরসংস্কৃতি বাঙালিরা তাদের মননে নতুন রূপে গ্রোথিত হয়েছে। এতে বোঝা যায় বাঙালিরা স্বরূপ জীবনবাদী। জীবন-জীবিকার নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ সব সময়ই বাঙালিরা কামনা করে আসছে।

এটা স্পষ্ট যে, প্রাচীনকাল থেকেই বাঙালি সমাজ বিজাতি ও বিদেশি শাসক দ্বারা শাসিত হলেও নিজস্ব মনন সাধনার ব্যাপারে তারা সব সময়ই ছিল স্বতন্ত্র। জীবন ও জগৎ, সমাজ ও সংস্কৃতি ধর্ম ও দর্শনচর্চা বিষয়ে বাঙালি বাইরের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করলেও নিজ জাতিসত্তা এমনকি নিজ সংস্কৃতিকে পুরোপুরি বিকিয়েও দেয়নি। বাইরের সংস্কৃতির ভালো দিক গ্রহণ করে তার সাথে নিজ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রাগ্রসর চিন্তা-চেতনার সম্মিলন ঘটিয়ে সে উন্নততর কিছু রচনা করতে

চায়; চায় নতুন কিছু আবিষ্কার করতে। বলা প্রয়োজন যে, বাঙালির এ প্রাগ্রসর চিন্তা ও চেতনা এবং ধর্ম ও মনন সাধনায় বুদ্ধিদীপ্ত মানব সমাজ সবসময়ই গুরুত্ব পেয়েছে বেশি। অর্থাৎ, মানুষকে যন্ত্র হিসেবে নয় বরং মানুষকে মানুষ হিসেবে দেখা বাঙালির মনন সাধনার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য।[৩৩] এ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বাঙালি ইতিহাসের সকল যুগেই বিদ্যমান রয়েছে।

১.৮. বাঙালির দার্শনিক ঐতিহ্য:

একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, বাঙালির রয়েছে এক গৌরব উজ্জ্বল দর্শন; রয়েছে এ দর্শনের তথ্যসমৃদ্ধ এক ইতিহাস। বাঙালির আধ্যাত্মিক, পারলৌকিক মানসিকতা দেখে অনেকেই এ জাতির দর্শন বিশ্লেষণে আগ্রহ হারান, দুঃখ ও আক্ষেপ করে থাকেন বাঙালির আবেগাতিশয্য ও দার্শনিক দারিদ্র্যতা নিয়ে। বাঙালি মাত্রই জীবনবিমুখ, কর্মকুণ্ঠ ও পরলোকমুখী; এ কারণে পাশ্চাত্য দর্শনের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বাঙালির দর্শনে খুব একটা দেখা যায় না। তবে তাই বলে এ জাতির দর্শনে তত্ত্বচিন্তা একেবারেই থাকবে না তা ভাবা অমূলক।[৩৪] বিশেষ করে জ্ঞানতত্ত্বের আলোচনায় এ বিশ্লেষণ প্রবণতা কখনো একটা স্বতন্ত্র ধারার জন্ম দিতে পারেনি, বরং শেষ পর্যন্ত মোক্ষতত্ত্বের পাদটীকা হিসেবেই কাজ করছে। বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনে ছোট ছোট বিভিন্ন তত্ত্বধারা আলোচিত হলেও সে আলোচনা কখনোই শুদ্ধ জ্ঞানের খাতিরে করা হয়নি বরং শেষ পর্যন্ত তা নির্বাণ লাভের বাহন হিসেবে কাজ করেছে। বেদকে একবার অপৌরুষেয় প্রামাণ্য হিসেবে মনে করলে বেদের গূঢ় রহস্য আবিষ্কারে সমস্ত প্রতিভা ব্যয় করা ছাড়া দার্শনিকদের পক্ষে বিশেষ কিছু করার থাকে না। অন্যদিকে, পাশ্চাত্যের দার্শনিকেরা কোনো কিছুকেই চূড়ান্ত বলে গ্রহণ না করে বরং খোলা মন নিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে প্রশ্ন আবিষ্কারে মনযোগী থেকেছেন-সবকিছুতেই প্রশ্ন করতে পেরেছেন স্বাধীনভাবে। তীব্র কৌতূহল নিয়ে জগৎ ও জীবনের জটিলতর বিভিন্ন সমস্যা উদঘাটনে সচেষ্ট থেকেছেন, সফলও হয়েছেন। তাইতো বলা যায়, আজ আমরা একটি পরিপূর্ণ জীবনবাদী দর্শন আবিষ্কার করতে পেরেছি। নিরন্তর প্রচেষ্টা আমাদের অব্যাহত রয়েছে নতুন নতুন প্রশ্ন আবিষ্কার করা ও সেসবের উত্তর খোঁজার।[৩৫]

বাঙালি শঙ্কর জাতি বলে এ জাতির মনে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিন্তাশক্তির পরিবর্তে আবেগ খানিকটা বেশি প্রশ্রয় পেয়েছে বৈকি। কিন্তু তাই বলে, বাঙালির সাহিত্য-দর্শনে বিচারশীল মনোবৃত্তির উপস্থিতি একেবারে অস্বীকার করা যায় না। যেমন-ষোলো শতকে এ অঞ্চলে চৈতন্যদেবের প্রেম ভক্তিবাদ ছিল প্রবল। তাছাড়া, এর পাশাপাশি ছিল রঘুনন্দের নব্যস্মৃতি, রঘুনাথের নব্যন্যায়, কৃষ্ণানন্দ আগম বাগীশের তন্ত্রগ্রন্থ। এসব গ্রন্থে প্রেম-প্রীতি, আবেগের পাশাপাশি রয়েছে যুক্তিশীল, বিচারশীল

দর্শনতত্ত্বের যা বাঙালির দর্শন রচনার মূল তত্ত্ব বলে বিবেচিত।[৩৬] বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক ও ধর্মভিত্তিক ঐতিহ্যে ধর্মপ্রবণতা, আধ্যাত্মিকতা ও পারলৌকিক মানসিকতার পাশাপাশি সমান্তরালভাবে উপস্থিত দেখা যায় একটি ধর্মনিরপেক্ষ, বস্তুবাদী ও ঐহিক ধারার। ফলে, বেশিরভাগ বাঙালি যথার্থ জীবন বলতে পারলৌকিক জীবনকে বুঝলেও আবার অনেকে বুঝেছেন দেহধারস্থিত সেই চেতনাকে যাকে বস্তুবাদী দর্শনে মস্তিষ্কের ক্রিয়া বলে অভিহিত করা হয়।

১.৯. বাঙালির চিন্তায় যুক্তি ও ভাবাবেগঃ

মানুষের নৈতিক জীবনকে পরিপূর্ণ করে আদর্শ মানুষে রূপান্তরিত করার জন্য দর্শন চর্চা অপরিহার্য্য। তাছাড়া, যুক্তির আলোকে জীবন ও জগতকে বিশ্লেষণ তথা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে চিন্তার ব্যাপকতা বাঙালির দর্শন চিন্তার একটি অন্যতম দিক। প্রাচীন ও মধ্যযুগে বাঙালি সাহিত্যে যুক্তির চেয়ে অনুভূতির, বিচার-বিশ্লেষণের চেয়ে হৃদয়াবেগের প্রবণতাই ছিল বেশি। যেকোনো কারণেই হোক না কেন, বাঙালির মনে হৃদয়াবেগ একটু বেশি ভর করে আছে। ষোলো শতকে এ অঞ্চলে চৈতন্যদেবের প্রেমভক্তিবাদ ছিল প্রবল। তবে, এ অঞ্চলে চর্চিত ধর্মগ্রন্থে শুধুমাত্র রসাত্মক ভক্তিবাদেরই নিদর্শন পাওয়া যায় না, বরং পরিচয় মেলে বাঙালির মনন ও সংস্কৃতি বিকাশের তথা আবেগের পাশাপাশি যুক্তি ও বিচার পদ্ধতির।[৩৭] বাঙালির ইতিহাসে বৈষ্ণব ভক্তিবাদ কিংবা সুফিতত্ত্ব যেমন আলোচনার বিষয়বস্তু, তেমনি লক্ষণীয় নব্যন্যায়ের বুদ্ধিবাদী আলোচনাও। অর্থাৎ, শুধু ভাবাবেগই নয় বরং 'আবেগ' ও 'বুদ্ধি' জ্ঞানের এ দুটি উপাদান অঙ্গাঅঙ্গিভাবে মিশে আছে বাঙালির জাতিসত্তায়।

বাঙালির চিন্তা ও সাহিত্যে যুক্তি-তর্কের চেয়ে ধর্ম প্রবণতার প্রভাবই বেশি দেখা যায়। একথা স্পষ্ট যে, শুধুমাত্র বাঙালিরাই নয় বরং এ প্রবণতা ভারতীয় উপমহাদেশ থেকে শুরু করে যুক্তিবাদী দর্শনের ক্ষেত্রভূমি বলে বিবেচিত ইউরোপেও তা দৃশ্যমান। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় উপমহাদেশে দর্শনের সাথে বিশ্বাসের সম্পর্ক ছিল খুবই ঘনিষ্ঠ। প্রাচ্যের আস্তিক দার্শনিকদের কেউ কেউ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করলেও তাঁদের কেউই বৈদিক ধর্মীয় ঐতিহ্য ও আচার অনুষ্ঠানের বিরোধিতা করেননি। অন্যদিকে, নাস্তিক দার্শনিকদের কেউ কেউ বেদের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রচলিত ধর্মমতের প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। একথা স্পষ্ট যে, যুক্তি এবং বুদ্ধিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র অন্ধবিশ্বাসকে পুঁজি করে অগ্রসর হলে কেবল ব্যক্তিই নয়, গোটা সমাজব্যবস্থাই বিপথগামী হবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ, অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসে যুক্তির পরিবর্তে ধর্মযাজক তথা ধর্মগুরুর মতকেই বেশি প্রাধান্য দেয়া হয়। তবে, দর্শনের ইতিহাসে ধর্মাচ্ছন্ন এ যুগের উপস্থিতি যে কেবলমাত্র ভারতীয়

উপমহাদেশেই ছিল তাই নয় বরং সুদূর ইউরোপের দর্শনও ছিল খ্রিষ্টধর্মের প্রভাবে প্রভাবিত। তখনকার সময়ে দর্শনের কাজ ছিল ধর্মীয় চিন্তাধারার মূল্যায়ন বা খণ্ডন করা নয় বরং নির্বিচারে দার্শনিক মত গ্রহণ করা।[৩৮] ধর্ম বিশ্বাসই তখন নির্দেশ করছে দার্শনিক জ্ঞানের স্বরূপ, সীমা ও লক্ষ্যকে। পৃথিবীকে তখন দেখা হতো নীচের একটি কক্ষ হিসেবে যার উপরে রয়েছে বিরাজমান ঈশ্বরের কৃপার রাজত্ব। উল্লেখ্য, বুদ্ধি এবং যুক্তিকে তখন ব্যবহার করা হতো বিশ্বাসকে মজবুত করার কাজে।

একথা অনস্বীকার্য যে, আধুনিককালের বুদ্ধিবাদী ও বিচারবাদী দার্শনিকরাও ধর্মীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। যেমন দেকার্ত, স্পিনোজা, লাইবনিজ, কান্ট, হেগেল প্রমুখ আধুনিককালের দার্শনিকগণ তাঁদের দার্শনিক যুক্তির অন্তরালে সজ্ঞানে লালন করছেন হৃদয়াবেগ, নীতিবোধ ও ধর্মানুগত্যকে। ইমানুয়েল কান্ট তাঁর *Critique of Pure Reason* গ্রন্থে দার্শনিক যুক্তি দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণে ব্যর্থ হয়েই রচনা করেছেন পরবর্তী গ্রন্থ *Critique of Practical Reason* এবং এ গ্রন্থে তিনি পরলোক ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য বেছে নিয়েছেন নীতিবোধ ও নৈতিক নিয়মকে। বললে অত্যুক্তি হবে না যে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ছিল কান্টের পূর্বসংস্কার। আর সেই সংস্কারকেই তিনি প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন নৈতিক নিয়ম ও নীতিবোধের দোহাই দিয়ে। কান্টের এই মনোবৃত্তির সহজ, সরল, অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা যায় এ উপমহাদেশের বিভিন্ন বৈষ্ণব কবির ভক্তিবাদী উক্তিতে। এটা স্পষ্ট যে, শুধু বাঙালির মননেই নয় বরং পৃথিবীর সব মানুষের মনেই আবেগ ও যুক্তি; বিশ্বাস ও বিচার এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, এদের একটিকে অন্যটি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করা যায় না। জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তার আলোকে আমরা নির্ধারণ করি নৈতিক, নান্দনিক ও ধর্মীয় অনুভূতিকে; আবার জ্ঞানবুদ্ধির আলোকেই এদের একটিকে অন্যটি থেকে বিচ্ছিন্ন করি। এভাবে আবেগ ও বিশ্বাসের সাথে বুদ্ধি ও জ্ঞানের যদি সম্মিলন না ঘটত, তাহলে অনুভূতি থেকে যেত অন্ধকারে। সাহিত্য, সংস্কৃতি, নন্দনতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব তখন অবনত হয়ে পরিণত হতো প্রকৃতির সেবাদাসে। নৈতিক, নান্দনিক কিংবা ধর্মীয় অনুভূতি থেকে যে হৃদয়াবেগের উদ্ভব হয়, তাকেও সংযত ও পরিস্ফুটিত করতে হয় দার্শনিক যুক্তিবিচার দ্বারা। এভাবে আবেগ ও বুদ্ধি; ভক্তি ও যুক্তির সমন্বয়ে যে তত্ত্বের উদ্ভব ঘটে তাকেই দর্শনের ইতিহাসে বলা হয় ধর্ম দর্শন যা বাঙালির হৃদয়কে নাড়া দিয়েছে বারবার।

১.১০. উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, বাঙালির দর্শন চর্চার ইতিহাস বেশ পুরোনো। বাঙালির নৃ-তাত্ত্বিক ও ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যকে অবলম্বন করে যুগ-যুগান্তরের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে এ দর্শন ঐতিহাসিকভাবে গড়ে উঠেছে, যা প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিককাল থেকে শুরু করে আধুনিককাল পর্যন্ত বাঙালির চিন্তা, সংস্কৃতি ও দর্শনে যে বিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা

বাঙালির গৌরব উজ্জ্বল দর্শনের ইতিহাসকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। একটি স্বাধীন স্বাতন্ত্র রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের চিন্তা-চেতনা ও মননের ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে স্বকীয় ও গৌরবময় বৈশিষ্ট্য, যার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় দর্শনেও। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র এমনকি রক্তের ভিন্নতা সত্ত্বেও বাঙালিদের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতির এক নিবিড় বন্ধন গড়ে উঠেছে। এ রকম প্রাণবন্ত সামাজিক বন্ধনের উদাহরণ পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে তেমনটি দেখা যায় না। ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সমাজ-সভ্যতা-শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রভৃতি বিচারে বাঙালির নানা মাত্রিক দর্শন বৈচিত্র্যময় যা আমাদের দার্শনিক দরিদ্র অনেকখানি ঘুঁচিয়েছে। কাজেই, এ দর্শনের জ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বাজাত্যবোধকে উজ্জীবিত করে জাতি গঠনের কাজে আমাদেরকে আত্মনিয়োগ করতে হবে, জাতিকে দিতে হবে দর্শনের আলোকবর্তিকার সঠিক দিশা। এভাবে বাঙালি জাতি মানবিকতার মহান আদর্শকে ধারণ করে নিজস্ব দর্শন নিয়ে বিশ্বের দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে।

তথ্যনির্দেশঃ

১. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, আদি পর্ব, কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং, ১৩৫৯, পৃ. ২৩-৩৮।

২. মতিউর রহমান, *বাঙালির দর্শন*: মানুষ ও সমাজ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ২০০০, পৃ. ১২৪-১২৭।

৩. সত্যনারায়ণ দাশ, বাঙালির মনন সাধনা, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৪, পৃ. ২১-২৯।

৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীনযুগ, কলকাতা: জেনারেল প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশার্স লি:, ২০০৫, পৃ. ৩-৭।

৫. পূর্বোক্ত, পৃ: ৬৩-৬৯।

৬. F. Thilly, *A History of Philosophy,* Allahabad: Central Book Depo., 1958, পৃ. ১৫০-১৫৩।

৭. রমেশচন্দ্র মজুমদার, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, প্রাচীনযুগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৫৪।

৮. শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাঙলা ও বাঙালি*, কলিকাতা: আনন্দ বুক ডিপো, ১৯৯০, পৃ. ৬৯-৭০।

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯-১০৭।

১০. আনন্দ মোহন বসু, *বাংলা ভাষার ইতিহাস*, কলকাতা: এ মুখার্জী এন্ড কোং, ১৯৭৬, পৃ. ৩-১৭।

১১. সত্যনারায়ণ দাস, *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা*, কলিকাতা: জিজ্ঞাসা, ১৯৭৮, পৃ. ২৯-৩৬।

১২. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, কলিকাতা: নিউ সেন্ট্রাল বুক এজেন্সী প্রাইভেট লি: ১৯৯৭, পৃ. ৯৯-১০৪।

১৩. সত্যনারায়ণ দাস, *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা*, প্রাগুক্ত, পৃ.১২৩-১২৯।

১৪. পরিতোষ কুমার কুণ্ডু, *ইতিহাস ও ঐতিহাসিক*, পাবনা: অর্ণব প্রকাশনী, ২০০৩, পৃ. ভূমিকা অংশ ও ৫৭-৬৭।

১৫. আবদুল করিম, *বাঙালির ইতিহাস*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৭; আরো দেখুন, মুহম্মদ আবদুর রহিম ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের ইতিহাস*, সপ্তম সংস্করণ, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৯৮, পৃ . ১৬৯-১৮৯।

১৬. আহমদ শরীফ, *বাঙলা সাহিত্য*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩, পৃ. ২৯-৩৭।

১৭. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, প্রথম পর্ব, কলকাতা: আনন্দ বুক ডিপো, ১৯৯০, পৃ. ৭-২১।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১-৬৭।

১৯. অজয় রায়, *আদি বাঙালি: নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ*, প্রথম প্রকাশ, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৭, পৃ. ১৯-২৯।
২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭-৫১।
২১. দীনেশচন্দ্র সেন, *বৃহৎ বঙ্গ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-৩১।
২২. সুশীলা মন্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস*, কলিকাতা: প্রকাশ মন্দির প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৬৩, পৃ. ৮৭-৮৮।
২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯-২৭।
২৪. অরুণ কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাংলাদেশের সাহিত্য ও সংস্কৃতি*, কলিকাতা: শ্রীমতি ছায়া চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৭, পৃ. ৪৯।
২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯-৫৬।
২৬. সুশীলা মন্ডল, *বঙ্গদেশের ইতিহাস*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৮-১০৭।
২৭. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, আদিপর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৯।
২৮. সুনীথানন্দ ভিক্ষু, *বাংলাদেশের বৌদ্ধ বিহার ও ভিক্ষু জীবন*, ঢাকা: বাংলা একাডমী, ১৯৯৫, পৃ. ২১-২৬।
২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১-৬৭।
৩০. অন্নদাশংকর রায়, *আধুনিকতা*, কলকাতা: ডি.এস. লাইব্রেরী, ১৯৫৩, পৃ. ২৬।
৩১. বিনোদবিহারী মজুমদার, *শ্রীচৈতন্য চরিতের উপাদান*, কলকাতা: কে.পি.জে. পাবলিশার্স, ১৯৫৯, পৃ. ৬৯।
৩২. শৈলেশ কুমার বন্দোপাধ্যায়, *বাঙলা ও বাঙালি*, প্রাগুক্ত পৃ. ১৩-১৯।
৩৩. কিরণচন্দ্র চৌধুরী, *ভারতের ইতিহাস কথা*, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৯-৬৮।
৩৪. সুনীল কুমার দাশ, *প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দিকদর্শন*, কলিকাতা: আধুনিক পুস্তক প্রকাশন, ১৩৮১, পৃ. ৯৯-১০৪।
৩৫. নীহাররঞ্জন রায়, *বাঙালির ইতিহাস*, আদিপর্ব, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৯-২৪৩।
৩৬. প্রিয়নাথ জানা, *বঙ্গীয় জীবনী কোষ*, কলিকাতা: মাতৃভাষা পরিষদ, ১৯৭৫, পৃ. ৪৮।
৩৭. সত্যনারায়ণ দাস, *বঙ্গদর্শন ও বাঙালির মনন সাধনা*, প্রাগুক্ত, ১৯৭৪, পৃ.৯-১৮।
৩৮. অমলেন্দু দে, *বাঙালি বুদ্ধিজীবি ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, কলকাতা: রত্না প্রকাশন, ১৯৭৪, পৃ. ৭৭-৮৩।